কোন আমলের ওজন হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা গালিগালাজকারী মন্দভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারা রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকে এবং সারাদিন রোযা রাখে।—(আবূ দাউদ)

হযরত মা'আয (রা) বলেনঃ (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময়) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটিতে যখন আমি এক পা রাখলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেনঃ

يا معاذ أحسن خلقك للناس—হে মা'আয, জনগণের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে।—(মালেক)

এসব রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হল।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ—শীঘ্রই আপনিও দেখে নেবেন এবং কাফিররাও দেখে নেবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এ স্থলে বিকারগ্রস্ত—পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সা)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ - وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ—অর্থাৎ আপনি মিথ্যা-রোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমাপূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। —(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'—কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের নামান্তর ও হারাম।—(মাযহারী) অর্থাৎ বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি না-জায়েয।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ - —আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎ কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زَنِيْم শব্দের অর্থ পিতৃ-পরিচয়হীন ---জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন-রূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফির ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خُرْطُوْم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خُرْطُوْم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ—অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াত-সমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মক্কাবাসী কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কায় অবতীর্ণ মনে করা হলেও এই তফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তফসীরবিদ এই আয়াতগুলোকে

মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুর্ভিক্ষের আযাব, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে যুবায়র-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল---(ইবনে কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে-কিতাব। ঈসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।--(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে 'আসহাবুল-জান্নাত' তথা উদ্যানওয়ালা নামে অভিহিত করা হয়েছে।. কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে, তাদের মালিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাষাবাদের ক্ষেতও ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিদ্ধির কারণে উদ্যানওয়ালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের বাচনিক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

ইয়ামনের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে ছরওয়ান নামক একটি উদ্যান ছিল। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল। তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ — অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পেছনে পেছনে না চলে। এই পরিকল্পনার

প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইনশআল্লাহ্ আগামীকাল এ কাজ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ لَا يَسْتَثْنُوْنَ-এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।---(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ—অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে এক বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُوْنَ—অর্থাৎ এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

كَالصَّرِيْمِ—صرم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم—এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। صريم-এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। ---(মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ—অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যূষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ—حرد শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোসা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দেবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَالُّوْنَ—যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান

কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছে; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ—আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ—তাদের মধ্যে যে মাঝারি ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করনা কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয় পবিত্র। যারা তার পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন।—(মাযহারী)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ—তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালিম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের আংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ—অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ—অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহ্‌গার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক-একটি আঙুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।—(মাযহারী)

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ—মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহ্‌ভীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবী করত যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবীর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দেবেন—এ কেমন উদ্ভট ও অভিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোন প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোন সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এরূপ দাবী করা হয়?

কিয়ামতের একটি যুক্তি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শাস্তি হওয়া যুক্তিগতভাবে অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধারণত যারা পাপাচারী, কুকর্মী, চোর-ডাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা লুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক রাত্রিতে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন ভদ্র ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোন লজ্জা-শরমের বাধাও মানে না; যে-ভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষান্তরে সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি প্রথমত আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুষ্কর্মী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন সামনেও যদি এমন সময় না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উত্তম পুরস্কার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মন্দ এবং গোনাহ্‌কে গোনাহ্ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়; দ্বিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এই প্রশ্নের কি জওয়াব দেবে যে, আল্লাহ্‌র ইনসাফ কোথায় গেল ?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাঞ্ছিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সৎ লোকের স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি ? উপরোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা, প্রথমত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রের দেখা শুনা সম্ভবপর নয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বত্র সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘুষ, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোর দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ যুগে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শাস্তি পায়, যারা চালাকী করে কোন চোর দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বুদ্ধিতার কারণে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, যুক্তিগতভাবে এরূপ সময় আসা জরুরী যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়া কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন كَشْفُ سَاقٍ অর্থাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ —অর্থাৎ যারা কিয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র

উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে বারবার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব বেদনাদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছেঃ আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দিই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্য অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন। আযাবের আলামত সামনেও এসে গিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আযাবের জায়গা থেকে অন্যত্র সরেও গিয়েছিলেন; কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আযাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ—এখানে হযরত ইউনুস (আ)-কে صاحب حوت 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ শব্দটি أزلاق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।---(রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলেঃ এ তো পাগল। وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ—অথচ এই কালাম বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ

কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফিরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَإِنْ يَّكَادُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।—(মাযহারী)

سورة الحاقة

সূরা হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ۝١ مَا الْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ
وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَاَمَّا عَادٌ
فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ
اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ
خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ
وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً
رَّابِيَةً ۝١٠ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣
وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ
وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝١٦ وَّالْمَلَكُ
عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝١٧
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ
بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝١٩ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ
حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوْفُهَا

دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۙ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ
كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ
إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾
وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ
لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা

(৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপিন তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৯) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে---একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ নাও তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ হায়! আমায় যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতএব আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নেই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত পূজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার---(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ

করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফিরদের জন্য অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (এই বাক্যের উদ্দেশ্য কিয়ামতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বর্ণনা করা) সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় এই খট্‌খট্ শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সামূদকে তো প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আদকে এক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা নির্মূল করা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস অবিরাম চড়াও করে রাখেন। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি (তখন সেখানে উপস্থিত থাকলে) তাদেরকে দেখতে যে, তারা অন্তঃসারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অত্যন্ত দীর্ঘদেহী ছিল)। তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ তাদের কেউ বেঁচে নেই। অন্য আয়াতে আছে ঃ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا এমনিভাবে) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা (কওমে নূহ, 'আদ ও সামূদ সবাই এতে দাখিল আছে)। এবং (লূত সম্প্রদায়ের) সংলগ্ন বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল (অর্থাৎ কুফর ও শিরক করেছিল। তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল (কুফর ও শিরক থেকে বিরত না হয়ে কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল)। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করেছিলেন। (তন্মধ্যে 'আদ ও সামূদের কাহিনী তো এইমাত্র বিবৃত হল। কওমে লূত ও ফিরাউনের পরিণতি অনেক আয়াতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং কওমে নূহের শাস্তি পরে বর্ণিত হচ্ছে)। যখন (নূহের আমলে)। জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ মু'মিনদেরকে, কারণ তাদের মুক্তি তোমাদের অস্তিত্বের কারণ হয়েছে) নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম) যাতে এই ব্যাপারকে আমি তোমাদের জন্য স্মৃতি করে দিই এবং কান একে স্মরণ রাখে। (কান স্মরণ রাখে ---কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। সারকথা, এই ঘটনা স্মরণ রেখে যেন শাস্তির কারণ থেকে বেঁচে থাকে। অতঃপর কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তখন সিংগায় একমাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে, (অর্থাৎ প্রথম ফুঁক) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) উত্তোলিত হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মজবুত ও ফাটল-বিহীন হলেও সেদিন এরূপ থাকবে না; বরং তা দুর্বল ও বিদীর্ণ হয়ে যাবে)। এবং ফেরেশতাগণ (যারা আকাশে ছড়িয়ে আছে, যখন আকাশ ফাটতে থাকবে, তখন তারা) আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (এ থেকে জানা যায় যে, আকাশ মধ্যস্থল থেকে বিদীর্ণ হয়ে চতুর্দিকে সংকুচিত হবে। তাই ফেরেশতাগণও মধ্যস্থল থেকে প্রান্তদেশে চলে যাবে।

এসব ঘটনা প্রথম ফুৎকারের সময়কার। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়কার ঘটনা এই যে) সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। (হাদীসে আছে, বর্তমানে চারজন ফেরেশতা আরশকে বহন করছে। কিয়ামতের দিন আটজনে বহন করবে। সারকথা, আটজন ফেরেশতা আরশকে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। অতঃপর তাই বর্ণিত হচ্ছে ঃ) সেইদিন তোমাদেরকে (হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু (আল্লাহ্‌র সামনে) গোপন থাকবে না। অতঃপর (আমলনামা উঠিয়ে হাতে দেওয়া হবে, তখন) যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে (আনন্দের আতিশয্যে আশেপাশের লোকদেরকে) বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি (পূর্ব থেকেই) জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (অর্থাৎ আমি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ঈমানদার ছিলাম। এর বরকতে আল্লাহ্ আমাকে পুরস্কৃত করেছেন)। সে সুখী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেশতে থাকবে, যার ফলসমূহ (এতটুকু) অবনমিত থাকবে (যে, যেভাবে ইচ্ছা আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবে ঃ) বিগত দিনে (অর্থাৎ দুনিয়ায় থাকাকালে) তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমল-নামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিদারুণ অনুতাপ সহকারে) বলবে ঃ হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নিষ্ফল হল। এরূপ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ) ধর একে এবং গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে এবং শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (এই গজ কতটুকু, তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কেননা, এটা পরজগতের গজ। অতঃপর এই আযাবের কারণ বলা হচ্ছে ঃ) সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না (অর্থাৎ পয়গম্বরদের শিক্ষানুযায়ী জরুরী ঈমান অবলম্বন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তো দূরের কথা,) মিসকীনকে আহার্য দিতে (অপরকে) উৎসাহিত করত না। (সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত ইবাদতের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সৃষ্টির প্রতি দয়া। এই ব্যক্তি উভয়টি বর্জন ও অস্বীকার করেছিল বিধায় তার এই আযাব হয়েছে)। অতএব আজ এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতধৌত পানি ব্যতীত, (উদ্দেশ্য, সুখাদ্য পাবে না)। যা গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ খাবে না। (অতঃপর কোরআনের সত্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মধ্যে কিয়ামতের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোরআনকে মিথ্যা বলাই উল্লি-খিত আযাবের কারণ)। অতঃপর তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না, আমি তার শপথ করছি, (কেননা কোন কোন সৃষ্টি কার্যত অথবা ক্ষমতাগতভাবে দেখার শক্তি রাখে এবং কোন কোন সৃষ্টি এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই শপথের বিশেষ সম্পর্ক এই যে, কোরআন পাক নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা তাদের দৃষ্টিগোচর হত না এবং যার কাছে কোরআন অবতীর্ণ হত, তিনি দৃষ্টিগোচর হতেন। অতএব এখানে সমগ্র 'সৃষ্টির

শপথ বোঝানো হয়েছে)। নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার আনীত (আল্লাহ্‌র) কালাম (অতএব যার প্রতি এই কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রসূল) এটা কোন কবির রচনা নয় [কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলত; কিন্তু] তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (এখানে 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়-বাদীর কথা নয় (কোন কোন কাফির এরূপ বলত; কিন্তু) তোমরা কমই অনুধাবন কর (এখানেও 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে। সারকথা, কোরআন কবিতাও নয়---অতীন্দ্রিয়বাদও নয়; বরং) এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (অতঃপর এর সত্যতার একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ) যদি সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) আমার নামে কোন (মিথ্যা) কথা রচনা করত (অর্থাৎ যা আমার কালাম নয়, তাকে আমার কালাম বলত এবং মিথ্যা নবুয়ত দাবী করত) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (কণ্ঠশিরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর মিথ্যারোপকারীদের প্রতি শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। এ দিক দিয়ে) এই কোরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ। (কেননা, মিথ্যারোপের কারণে এটা তাদের আযাবের কারণ)। এই কোরআন নিশ্চিত সত্য। অতএব (এই কোরআন যাঁর কালাম) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার পবিত্রতা (ও প্রশংসা) বর্ণনা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী, কাফির ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মু'মিন আল্লাহ্‌ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামতকে হাক্কা, কারিয়া, ওয়াকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

الْحَاقَّةُ শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন-কারী। কিয়ামতের জন্য এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কিয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মু'মিনদের জন্য জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বারবার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

الْقَارِعَةُ শব্দের অর্থ খটখট শব্দকারী। কিয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই একে الْقَارِعَةُ বলা হয়েছে।

بِالطَّاغِيَةِ শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন

ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামূদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

ريح صرصر—এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ—এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল।

حُسُوْمًا—শব্দটি حاسم এর বহুবচন। এর অর্থ মূলোৎপাটন করে দেওয়া।

مؤتفكات এর অর্থ পরস্পরে মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ—তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে صور শিং-এর আকারের কোন বস্তুকে বলা হয়। কিয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কিয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে نفخة صعق বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ فَصَعِقَ مَنْ فِى—

السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ—অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে)। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نفخة بعث বলা হয়। بعث শব্দের অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنظُرُونَ---অর্থাৎ পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْخَةُ فَزَع কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نَفْخَةُ فَزَع বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْخَةُ صَعْق হয়ে যাবে।----(মাযহারী)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ---অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে চারজন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চারজন মিলিত হবে।

আল্লাহ্র আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ---অর্থাৎ সে দিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ---هَاؤُمُ শব্দের অর্থ নাও। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ---سلطان শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর

আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। سلطان-এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خذوه فغلوه—অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্য দৌড় দেবে।

ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه—অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহ্‌র দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।—(মাযহারী)

فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام الا من غسلين—حميم এর অর্থ সুহৃদ। غسلين সেই পানি, যদ্দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু হবে না। 'কিছু হবে না' এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নাই।

فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون—অর্থাৎ সে সব বস্তুর শপথ যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখ না' বলে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

ولو تقول علينا تقول শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وتين হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফিরদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়তাবাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। كاهن তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষত্রবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আল্লাহ্র কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসূল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করত, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ যদি এই রসূল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ না করুন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নামে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোন আযাব আসেনি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—এর আগের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্য উপদেশ। কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছেঃ

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ—অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। সবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ-এতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ—অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফিরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

আবূ দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একে তোমাদের রুকূতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সিজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিনবার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

سورۃ المعارج

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪৪ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢ مِّنَ
اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝٤ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝٥
اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝٦ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ
كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝١٠
يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۝١١
وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝١٢ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۝١٣ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝١٤ كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ۝١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝١٦ تَدْعُوْا
مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝١٧ وَجَمَعَ فَاَوْعٰٓى ۝١٨ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝١٩
اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝٢٠ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝٢١ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝٢٢
الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝٢٣ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُوْمٌ ۝٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝٢٥ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝٢٦ وَ
الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝٢٧ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَاْمُوْنٍ ۝٢٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٢٩ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ
عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾
كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ
نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ
الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত---(২) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আপনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্‌গার ব্যক্তি মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সব-কিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান

অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হাহুতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে (২৪) এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল---নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে---যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি (অস্বীকারের ছলে) চায় সেই আযাব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত (এবং) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই (এবং) যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের (অর্থাৎ আকাশসমূহের) মালিক। (যেসব সিঁড়ি বেয়ে) ফেরেশতাগণ এবং (ঈমানদারদের) রূহ্ তাঁর কাছে ঊর্ধ্বারোহন করে। (তাঁর কাছে অর্থ ঊর্ধ্ব জগত, যা তাদের ঊর্ধ্ব গমনের শেষ সীমা। এই ঊর্ধ্ব গমনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আযাব) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন কিছুটা আসল পরিমাণের কারণে এবং কিছুটা ভয়াবহতার কারণে দিনটি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ মনে হবে। কুফর ও অবাধ্যতার পার্থক্য হেতু এই দিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ বিভিন্নরূপ হবে---কারও জন্য অনেক বেশী এবং কারও জন্য কম। তাই এক আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্যই। হাদীসে আছে,

মু'মিনদের জন্য দিনটি এক ফরয নামায পড়ার সমান ছোট মনে হবে)। অতএব (আযাব যখন আসবেই) আপনি (তাদের বিরোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন ছবর, যাতে অভিযোগ নেই। (অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে এমন মনঃক্ষুণ্ন হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উচ্চারিত হয়ে যায়, বরং তাদের শাস্তি হবে---এই মনে করে সহ্য করে যান। তাদের অস্বীকার করার কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আযাবকে (অর্থাৎ এর বাস্তবতাকে) সুদূর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরূপে জানি বলে) একে আসন্ন দেখছি। (এই আযাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (রং-এ) তেলের তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়াতে كَالدِّهَانِ অর্থাৎ লাল চামড়ার ন্যায় বলা হয়েছে। লাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কালো মত রং হয়ে যায়। সুতরাং লাল ও কালো উভয়টিই শুদ্ধ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবর্তিত হয়ে অন্য রং হবে। কোন কোন তফসীরবিদের ন্যায় যদি এর তফসীরেও ময়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক হয়ে যাবে। সারকথা, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে) এবং পর্বত-সমূহ হয়ে যাবে রঙিন (ধুন করা) পশমের ন্যায় (যেমন অন্য আয়াতে كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ বলা হয়েছে অর্থাৎ উড়তে থাকবে। পর্বতও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে। তাই রঙিন বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) এবং (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না (যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَتَسَاءَلُونَ) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে অর্থাৎ (একে অপরকে দেখবে কিন্তু কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। সূরা সাফ-ফাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের কথা মতানৈক্যের ছলে আছে, সহানুভূতির ছলে নয়। তাই এই আয়াত সেই আয়াতের পরিপন্থী নয়। সেদিন) অপরাধী (অর্থাৎ কাফির) মুক্তিপণ-স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভ্রাতাকে, গোষ্ঠীকে, যাদের মধ্যে সে থাকত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে (আযাব থেকে) রক্ষা করতে চাইবে। (অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কাল পর্যন্তও যার জন্য জীবন উৎসর্গ করত, আজ তাকে নিজের স্বার্থে আযাবে সোপর্দ করে দিতে প্রস্তুত হবে কিন্তু) এটা কখনও হবে না। (অর্থাৎ কিছুতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না বরং) এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া (পর্যন্ত) তুলে দিবে। সে (নিজে) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দুনিয়াতে সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (ইবাদতে) বিমুখ হয়েছিল এবং

(অপরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে অথবা লালসাবশত) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভ্রষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ডাকা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে। অতঃপর আযাবের কারণ হয়, এরূপ অন্যান্য মন্দ স্বভাব; তা থেকে মু'মিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ) মানুষ ভীরু সৃজিত হয়েছে। (মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে। সৃজিত হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম সৃষ্টির সময় থেকেই সে এরূপ বরং অর্থ এই যে, তার স্বভাবে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে এসব মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বভাবগত ভীরুতা নয় বরং ভীরুতার ইচ্ছাধীন মন্দ প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে (বৈধ সীমার বাইরে) হাহুতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন (জরুরী হক আদায়ে) কৃপণ হয়ে যায়। (এ হচ্ছে مَنْ اَدْبَرَ থেকে বর্ণিত আযাবের কারণসমূহের পরিশিষ্ট)। কিন্তু নামাযী (অর্থাৎ মু'মিন আযাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম ভুক্ত) যে তার নামাযের প্রতি ধ্যান রাখে (অর্থাৎ নামাযে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না)। এবং যার ধনসম্পদে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের হক আছে এবং যে প্রতিফল দিবসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তার পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তার স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় (সংযত রাখে না); কেননা তাদের বেলায় এতে কোন দোষ নেই। অতএব যারা এদের ছাড়া (অন্য জায়গায় যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে) চায়, তারাই (শরীয়তের) সীমালংঘনকারী। এবং যে তার আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষ্যদানে সরল--নিষ্ঠাবান। (তাতে কমবেশী করে না)। এবং যে তার (ফরয) নামাযে যত্নবান। তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্যজনক অবস্থা এবং কিয়ামতের অনস্বীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন পরিষ্কাররূপে সপ্রমাণ হয়েছে, তখন) কাফিরদের কি হল যে, (এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য) তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না করে সংঘবদ্ধ হয়ে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসে। সেমতে নবুয়তের খবর শুনে শুনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সত্যপন্থী মনে করত। এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জান্নাতের যোগ্য পাত্রও মনে করত, যেমন বলত ঃ وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى

তাই এ বিষয়টি অস্বীকারের ছলে বলা হচ্ছে ঃ) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? কখনই নয়। (কেননা জাহান্নামের কারণাদির উপস্থিতিতে তারা জান্নাত কিরূপে পেতে পারে? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিয়ামতকেও অস্বীকার করত ও অসম্ভব মনে করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেননা) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্য থেকে মানব সৃজিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নির্জীব বীর্য ও সজীব মানবের যতটুকু ব্যবধান মৃতের অংশ ও পুনরুজ্জীবিত মানবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নেই। কেননা, মৃতের অংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা। অতঃপর অন্যভাবে কিয়ামতের অসম্ভাব্যতা দূর করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ) আমি শপথ করছি পূর্বাচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার (শপথের জওয়াব এই ঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুনিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (সুতরাং অধিকতর গুণসম্পন্ন নতুন মানব সৃষ্টি করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয় না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে (লজ্জায়) অবনমিত এবং তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سوال—سال سا ئل শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে با ء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল ঃ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم হে আল্লাহ্! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন। (মাযহারী) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন। (মাযহারী) সে আল্লাহ্র কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

معارج শব্দটি معرج এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। معراج ও معرج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্য অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষণ ذى المعارج এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নিচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রা) ذى المعارج-এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ—অর্থাৎ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল আমীন' অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ—অর্থাৎ উল্লিখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি ---এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে। ---(মাযহারী)

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছেঃ يكون على المؤ منين كمقدار ما بين الظهر و العصر ---অর্থাৎ এই দিনটি মু'মিনদের জন্য জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।---(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার অর্থাৎ কাফিরদের জন্য এতটুকু দীর্ঘ এবং মু'মিনদের জন্য এতটুকু খাট হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ আল্লাহ্‌র কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্ব গমন করেন এমন এক দিকে যা তোমাদের হিসাব

অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফিরদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মু'মিনদের জন্য এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবত কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশ বছরের ব্যবধান আছে। অতএব পাঁচশ বছর নিচে আসার এবং পাঁচশ বছর ঊর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কিয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا—এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা---বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ—حميم শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না ---সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় বরং আল্লাহ্র কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ—لظى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شوى শব্দটি شواة -এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ

জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, যা মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى—এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا—هلوع-এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য, ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধনসম্পদের লোভ করে। সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেনঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেনঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هلوع শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هلوع শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছেঃ

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا—অর্থাৎ মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হাহুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হাহুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مصلين শব্দ বলে مؤمنين বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মু'মিন বলার যোগ্য

হতে পারে। অতঃপর তাদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى

صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ---অর্থাৎ যে নামাযী তার সমগ্র নামাযে নামাযের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (র) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন ঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেন ঃ না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ

يُحَافِظُوْنَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লিখিত মু'মিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মু'মিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই ঃ وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ---এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ---এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারাম ঃ অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন ঃ আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মকরূহ বললেন। তিনি আরও বললেন ঃ আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ملعون من نكح يد ৪ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য।---(মাযহারী)

সব আল্লাহ্র হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ—এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا—উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্র হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।---(মাযহারী)

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ—এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।---(মাযহারী)

سورۃ نوح

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ قَالَ
رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِيْٓ اِلَّا
فِرَارًا ۝٦ وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ
اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ اِنِّيْ
دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝٩
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُّرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ
مِّدْرَارًا ۝١١ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ
لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝١٤
اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝١٥ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ
نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧ ثُمَّ

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ
عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ
أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। (২) সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দিষ্টকাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন,' (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না! (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। (১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ্ বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে ঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহ্‌সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে ---তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ্ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছিলাম একথা বলে ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে (কুফরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বল ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে---দুনিয়াতে মহাপ্লাবন কিংবা পরকালে জাহান্নাম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ক-কারী। (আমি বলি ঃ) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর), তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় পর্যন্ত (বিনা শাস্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে মৃত্যুর পূর্বে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া মৃত্যুর তো) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় (আছে) যখন (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন সর্বাবস্থায় জরুরী---ঈমান অবস্থায়ও,

কুফর অবস্থায়ও। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবস্থায় পরকালের আযাব ছাড়া দুনিয়াতেও আযাব হবে এবং এক অবস্থায় উভয় জাহানে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)। খুব চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয়) বুঝতে! (যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসব উপদেশ সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, তখন) নূহ্ (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত্রি (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (পলায়ন এভাবে করেছে যে) আমি যতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, যাতে (ঈমানের কারণে) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে (যাতে সত্য কথা কানে প্রবেশও না করে; এটা চরম ঘৃণা)। মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে যাতে সত্য ভাষণদাতা দেখাও না যায় এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তারা কুফরে) জেদ করেছে এবং (আমার আনুগত্যের প্রতি চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে)। অতঃপর (এই ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেমতে) আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বক্তৃতা ও ওয়ায করেছি, যাতে স্বভাবতই আওয়াজ উচ্চ হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সম্বোধনস্বরূপ) ঘোষণা-সহকারে বুঝিয়েছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সম্ভাব্য সব পন্থায়ই বুঝিয়েছি। এ ব্যাপারে) আমি বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আন, যাতে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়)। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (তোমরা ঈমান আনলে পারলৌকিক নিয়ামত ক্ষমা ছাড়া তিনি ইহলৌকিক নিয়ামতও দান করবেন। সেমতে) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ মন নগদ ও দ্রুত নিয়ামত অধিক তলব করে, তাই এসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ তারা সংসারের প্রতি লোভী ছিল, তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি ঃ) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হচ্ছ না। অথচ (শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে) তিনি তোমাদেরকে নানাভাবে সৃষ্টি করেছেন। উপাদান-চতুষ্টয় দ্বারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মানব হয়েছ। এটা মানবসত্তার প্রমাণ, অতঃপর বিশ্বচরাচরের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে ঃ তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং তথায় চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হযরত আদম [আ] মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন, না হয় এভাবে যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, খাদ্য উপাদান-চতুষ্টয় থেকে এবং উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রবল)। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (মৃত্তিকা থেকে) পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা কর। (এসব কথা নূহ্ [আ] আল্লাহ্ তা'আলার কাছে

ফরিয়াদ করে বললেন। অবশেষে) নূহ্ (আ) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে অমান্য করেছে আর এমন লোকদের অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে, (এখানে সম্প্রদায়ের অনুসৃত সরদারবর্গ বোঝানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তাদের অবাধ্যতার কারণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুসৃত সরদাররা এমন) যারা (সত্যকে মিটানোর কাজে) ভয়ানক চক্রান্ত করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে) ত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (সমধিক প্রসিদ্ধির কারণে এসব দেবদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরা অনেককে পথহারা করেছে। (এই পথভ্রষ্ট করাই ছিল ভয়ানক চক্রান্ত। আপনার বক্তব্য لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ থেকে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোয়া করি) আপনি এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন; (যাতে ওরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য পাত্র হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, দোয়ার উদ্দেশ্য অধিক পথভ্রষ্টতা নয় বরং ধ্বংসের যোগ্য পাত্র হওয়ারই দোয়া করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিণতি এই হয় যে) ওদের এসব গোনাহ্র কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার পর) জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। নূহ্ (আ) আরও বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না; (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বর্ণিত আছে ঃ) আপনি যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে (لَنْ يُّؤْمِنَ---বক্তব্য অনুযায়ী) তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাপাচারী ও কাফির সন্তানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাফিরদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোয়া করলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। (এ স্থানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাফিরদের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছে ঃ) এবং জালিমদের ধ্বংস আরও বাড়িয়ে দিন। [অর্থাৎ ওদের উদ্ধারের যেন কোন উপায় না থাকে এবং ধ্বংসই যেন প্রাপ্ত হয়। এই দোয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নূহ্ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন ছিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দূরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ---يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ অব্যয়টি প্রায়শ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার

জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى—أجل مسمى এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আযাবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশংকা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণত তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্নের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তফসীরে মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তকদীর দুই প্রকার---১. চূড়ান্ত অকাট্য এবং ২. শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণত ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লওহে-মাহ্ফুযে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। 'আসল কিতাব' বলে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর লিখিত আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফয়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر—অর্থাৎ দোয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌র ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত নূহ্ (আ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আযাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ তে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে।

অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নূহ্ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ নূহ্ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেনঃ رب اغفر لقومى انهم لا يعلمون—অর্থাৎ হে আমার

পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য-পালনে মশগুল থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ্ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টমতি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আ) সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবা-রাত্রি দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে ---সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি---ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্র-দায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ্ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে, يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ---এ থেকে অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে খিলাফও হয় কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا---এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতে فِيهِنَّ বলায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ (আ) আরও বললেন ঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا—অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ (আ)-র পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লিখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আ)-র আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا —অর্থাৎ এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সে মতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْٓـَٔاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا — অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ্ অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আযাব কোরআন দ্বারা প্রমাণিত ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরে বাস করার সময়ও মৃতদের আযাব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কর্মীর আযাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামত-প্রাপ্ত হবে। সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আযাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা-আতের আলামত।

سورة الجن

সূরা জিন্ন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا
عَجَبًا ۝١ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۗ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢
وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣ وَّاَنَّهُ كَانَ
يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥ وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ
يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۗ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ
الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي
الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا
دُوْنَ ذٰلِكَ ۗ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي
الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ۗ فَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۗ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤ وَاَمَّا

الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ
لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ
اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّيْ لَآ
اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾
حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ
رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ
ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে ঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, (২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেন নি এবং তার কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা

বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন্-এর আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্ন্দের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবী-বাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন! (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্ম পরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে ডেকোনা। (১৯) আর যখন আল্লাহ্র বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন্ন্ তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুনঃ আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমন কি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্য-কারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না (২৭) তার মনো-নীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যাতে আল্লাহ্ জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূল-গণের কাছে যা আছে, তা তার জ্ঞানগোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযুল ঃ আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌঁছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা হল। এই অভাবিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে একদল জিন্ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সূরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা এই ঃ মূর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জঙ্গলে অথবা বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন জিন্দের সরদারের হিফাযত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করত ঃ

اعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهاء قومه---অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুষ্টদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে বিরোধী কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে দুররে মনসূর থেকে এবং শেষোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিন্দের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর (স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে) তারা বলেছে ঃ আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিস্ময়কর প্রতিপন্ন হয়েছে)। আমরা (এখন থেকে) কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথারই ব্যাখ্যা)। এবং (তারা নিম্নোদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল ঃ) আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার শান ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (কেননা এটা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথার ব্যাখ্যা)। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা)। অথচ আমরা পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিন্ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না। (কেননা, এটা চরম ধৃষ্টতা। এতে তারা তাদের মুশরিক হওয়ার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ জিন্ ও মানব শিরক করত। এতে আমরা মনে করলাম যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এর অধিক লোক মিথ্যা বলবে না। সে মতে আমরাও সে পথ অবলম্বন করলাম। অথচ যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঐকমত্যের অনুসরণ ওযর হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিন্ন ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিন্দের কুফর ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তা এই যে,) অনেক মানুষ অনেক জিন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করত। ফলে তারা জিন্দের আত্মম্ভরিতা আরও

বাড়িয়ে দিত। (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিন্ন্দের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিলাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে। এতে তাদের আত্মম্ভরিতা চরমে পৌঁছে এবং কুফর ও হঠকারিতায় আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে। এপর্যন্ত তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ অর্থাৎ জিন্ন্রা পরস্পরে আলোচনা করল) আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহরারত ফেরেশতা) ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিন্ন্রা ঐশী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করা হয়। ইতিপূর্বে) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। (এসব ঘাঁটি আকাশগাত্রে কিংবা বায়ুমণ্ডলে কিংবা মহাশূন্যে হতে পারে। জিন্ন্রা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন ওজন নেই। তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম; যেমন কতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে)। এখন কেউ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। [উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে সূরা হিজরের দ্বিতীয় রুকূতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রিসালত সম্পর্কিত এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সা)-কে রিসালত দান করেছেন এবং বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অতীন্দ্রিয়বাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সংবাদ চুরি বন্ধ হওয়ার কারণেই এই জিন্ন্রা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছেছিল। প্রথম ঘটনা তাই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সমূহের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা জানি না (এই নতুন পয়গম্বর প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন? (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য জানা নেই। কারণ রসূলের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই। ফলে পয়গম্বর প্রেরণ করে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না। একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের অনুমান ছিল তাদের সম্প্রদায়ে মু'মিন কম হবে। কাজেই অধিকাংশ লোক শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া জিন্ন্রা অদৃশ্যের খবর জানে না বলে তওহীদের বিষয়বস্তু জোরদার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস এই যে, জিন্ন্রা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে)। আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (এমনিভাবে এই পয়গম্বরের খবর শুনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোক আছে। আমাদের পথ এই যে,) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে যেয়ে) আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পলায়ন করেও তাঁকে পরাভূত করতে পারব না। (পলায়ন করার অর্থ পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া। এটা فِى الْاَرْضِ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যায়।

অন্য এক আয়াতে তদ্রূপ বলা হয়েছেঃ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ —এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত সতর্ক করা যে, আমরা কুফরী করলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কারও ঈমান না আনা সত্য যে সত্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, এটা চিরন্তন রীতি)। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে (আমাদের মত) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সৎকাজ অলিখিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ্ করা হয়নি, তা লিখিত হওয়া। উৎসাহ প্রদানই সম্ভবত এ কথার উদ্দেশ্য)। আমাদের কিছু সংখ্যক (এসব ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্তু বোঝে) আজ্ঞাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়) বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আজ্ঞাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (ফলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহান্নামের ইন্ধন। (এ পর্যন্ত জিন্নদের কথাবার্তা সমাপ্ত হল। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে) তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি (যে, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কাবাসীরা যদি উপরে জিন্নদের উক্তিতে নিন্দিত শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনায় বর্ণিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চেপে বসত না। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুফরের শাস্তি মক্কাবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে নয়; বরং) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠোর আযাবে দাখিল করে। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আল্লাহ্‌র হক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আল্লাহ্‌কে করা এবং কোন সিজদা অপরকে করা জায়েয নয়; যেমন মুশরিকরা করত)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কারও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোল্লিখিত তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। এবং ওহীর এক বিষয়বস্তু এই যে) যখন আল্লাহ্‌র বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ভিড় করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিস্ময় ও শত্রুতা হেতু প্রত্যেকেই এভাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে। এটাও তওহীদের পরিশিষ্ট। কেননা, এতে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা তওহীদকে ঘৃণা করে। অতঃপর এই বিস্ময় ও শত্রুতার জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ আমি তো কেবল আমার পালনকর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (অতএব এটা কোন বিস্ময় ও শত্রুতার বিষয় নয়। অতঃপর রিসালত সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছেঃ) আপনি

(আরও) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনার মালিক নই। (অর্থাৎ তোমরা যে আমাকে আযাব আনার ফরমায়েশ কর, এর জওয়াব এই যে, আমার এরূপ ক্ষমতা নেই। এমনিভাবে কেউ কেউ বলে যে, আপনি তওহীদ ও কোরআনে কিছু পরিবর্তন করলে আমরা আপনাকে মেনে নিব। এর জওয়াবে) আপনি বলুনঃ (আল্লাহ্ না করুন, আমি এরূপ করলে) আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা করবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকারী পাব না)। কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছোনো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (অতঃপর তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিররা এখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। এবং উল্টা মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে। তারা এই মূর্খতা থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল কম। (অর্থাৎ কাফিররাই দুর্বল ও কম হবে। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করে। জওয়াবে) আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। (কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটা সংঘটিত হবে। নির্দিষ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয়)। অদৃশ্যের জ্ঞানী তিনিই। পরন্তু অদৃশ্যের বিষয় তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নির্ধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে নবুয়ত সপ্রমাণকারী জ্ঞান যথা ভবিষ্যদ্বাণী অথবা নবুয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত জ্ঞান যথা বিধি-বিধানের জ্ঞান এগুলো প্রকাশ করার সময়) তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, [যাতে শয়তান সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং ফেরেশতাদের কাছে শুনে কারও কাছে বলতে না পারে। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এরূপ পাহারাদার ফেরেশতা চারজন ছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়,] যাতে আল্লাহ্ (বাহ্যত) জেনে নেন যে, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার পয়গাম (রসূল পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছে কি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাদের) সব অবস্থা জানেন (তাই এ কাজে দক্ষ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন)। তিনি সব কিছুর গণনা জানেন (সুতরাং ওহীর এক একটি অংশ তাঁর জানা আছে এবং তিনি সবগুলো সংরক্ষণ করেন। সারকথা এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের জ্ঞান নয়। তাই কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় না জানা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। তবে নবুয়তের জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং এতে কোন ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে না। অতএব তোমরা এসব জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হও এবং বাড়তি বিষয়ের পিছনে পড়ো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نفر—نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত

আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিন্নদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিন্নদের স্বরূপ ঃ জিন্ন আল্লাহ্ তা'আলার একপ্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই তাদেরকে জিন্ন বলা হয়। জিন্ন-এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন্ন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তারাও জিন্নদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন্ন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহ্র অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।--(মাযহারী)

لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ---থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্নদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন্ন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্নদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিন্নরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিন্নদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিন্নদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন।

আবূ তালেবের ওফাত ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তায়েফ গমন ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় তায়েফের সকীফ্ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক

(র) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফে পৌঁছে সকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃত্রয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ছিল ওমায়রের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে ভ্রাতৃত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

সকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বশুরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আল্লাহ্র দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনব ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই ঃ

اللّٰهم انى اشكو اليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس
و انت ارحم الراحمين و انت رب المستضعفين فانت ربى الى من
تكلنى الى بعيد يتجهمنى او الى عد و ملكته امرى ان لم تكن ساخطا
على فلا ابالى و لكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى
اشرقت له الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من ان تنزل بى
غضبك لك العتبى حتى ترضى و لا حول و لا قوة الا بك -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন---পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে; না কোন শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোন কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যদ্দ্বারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গযবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।---(মাযহারী)

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হল এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খৃস্টান গোলামকে ডেকে বলল ঃ একগুচ্ছ আঙ্গুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বল। গোলাম তাই করল। সে আঙ্গুরের পাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আদ্দাস, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল ঃ আমি খৃস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নায়নুয়া' শহরে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভাল কথা। তাহলে তুমি আল্লাহ্র সৎবান্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ)-র শহরের অধিবাসী। সে বলল ঃ আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা, তিনি যেমন আল্লাহ্র নবী, তেমনি আমিও আল্লাহ্র নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল ঃ আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল ঃ আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল ঃ আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বাবস্থায় তার ধর্মের চেয়ে ভাল।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামেনের নছীবাইন শহরের জিন্নদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।---(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী জিন্ন-এর ঘটনা ঃ ইবনে জওযী (র) 'আছ-ছফওয়া' গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিন্নকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রা) বলেন ঃ নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ বছর

ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন্ন্ সম্পর্কে 'সূরা জিন্ন্' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।---(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিন্ন্-এর ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিন্ন্দের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লিখিত আছে। এটা বাহ্যত সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিন্ন্দের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়---ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَ اَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا---جد শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বলা হয় تَعَالٰى جَدُّهٗ -অর্থাৎ আল্লাহ্র শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শান যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَّ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا---شطط শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন জিন্ন্রা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে : আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্র শানে অবাস্তব কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন্ন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا---এই আয়াতে মু'মিন জিন্ন্রা বলেছে : মূর্খতা যুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিন্ন্দের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিন্ন্রা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিন্ন্দের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

জিন্ন্দের প্রেরণায় হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ: তফসীরে-মাযহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিন্ন্' কিতাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা) সাহাবীর

ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি স্বগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম ঃ اني اعوذ بعظيم هذا الوادى অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিন্ন্ সরদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তদ্দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম ঃ

এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতিমধ্যে তিনটি বন্য গর্দভ সামনে এসে গেলে বৃদ্ধ যুবককে বলল ঃ এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য গর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ আমাকে বলল ঃ হে বোকা মানব! তুমি কোন প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিন্নদের উপদ্রব আশংকা কর, তবে এ কথা বলো ঃ اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادى অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোন জিন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিন্নদের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি আরব নবী —প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল ঃ ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদীনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলে করীম (সা) আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন ঃ আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে।

—وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا—আরবী অভিধানে سماء শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিন্ন্‌রা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো---আকাশ পর্যন্ত নয়ঃ জিন্ন্ ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস ঃ

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر الذى قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوجه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم -

হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি---ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে তারা আল্লাহ্‌র জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।---(মাযহারী)

বুখারীতেই আবূ হুরায়রা (রা)-র এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।---(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিন্ন্‌রা চিন্তিত হয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন্ন্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شهاب ثاقب বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এরজন্য انقضاض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দুষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا —

অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে---১. পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন্ ও শয়তান আল্লাহ্র ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا — بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رهق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا — مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদ-সমূহ কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের শিরকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مساجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পরে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেন তাকে সিজদা করে। অতএব অপরকে সিজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا—এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কিয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালন-কর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়েব' নই বরং আলেমুল গায়েব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে ? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا—উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না---এ কথার অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নয়। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়েবের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনি-র্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এ সব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শ্বে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই

গায়েব প্রমাণ করা হয়নি বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে-গায়েব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে انباء الغيب শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছেঃ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-গায়েব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্র আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।---(নাউযুবিল্লাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার গোপন ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ আলেমুল-গায়েব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়েবের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল-গায়েব হয়ে যাবেন না। অতএব বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলেমুল-গায়েব' নন, তখন তারা এই অর্থ বুঝে যে, নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন গায়েবের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেন না, এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রিসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মু'মিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছঃ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا —অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তা'আলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কত সংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে-গায়েব যে আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝা-বুঝিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়েবের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি বিধান সূরা নমলের قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

سورة المزمل

সূরা মুযযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۭ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۭ﴿٦﴾
اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۭ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ
تَبْتِيْلًا ۭ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
وَاصْبِرْ عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَ
الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا
﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ
الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ
رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۭ﴿١٥﴾ فَعَصٰى
فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَۨا ﴿١٧﴾ السَّمَاۗءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ
وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاۗءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ

وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۭ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۭ
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۣ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ
اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠ ع

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাত্রিতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধ রাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড, (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রসূল। (১৬) অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সে দিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাবৃত, [এভাবে সম্বোধন করার কারণ এই যে, নবুয়তের প্রথমভাগে কোরাইশরা তাদের 'দারুন্নদওয়া' তথা পরামর্শ গৃহে একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পরামর্শ করে। কেউ বলল ঃ তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী। অন্যেরা তাতে সায় দিল না। কেউ বলল ঃ তিনি উন্মাদ। এটাও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। আবার কেউ বলল ঃ তিনি যাদুকর। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেন। যাদুকর খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিষাদের সময় মানুষ এরূপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য ও কৃপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে আবূ তোরাব বলে সম্বোধন করেছিলেন। সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ সব বিষয়ের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে] রাত্রিতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি (এতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী (দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের চেয়ে কম সময়ে বিশ্রাম করুন। সারকথা, রাত্রিতে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া তো ফরয হল কিন্তু সময়ের পরিমাণ কতটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে---তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি—অর্ধ রাত্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি) এবং (এই দণ্ডায়মান অবস্থায়) কোরআন স্পষ্টভাবে পাঠ করুন (অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণ ও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আপনার প্রতি এক ভারী কালাম অবতীর্ণ করব

[অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উরু যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। ফলে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উষ্ট্রী বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারত না। কনকনে শীতের মধ্যে ওহী নাযিল হলেও তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এ ছাড়া কোরআনকে সংরক্ষিত রাখা ও অপরের কাছে পৌঁছানোও কষ্টসাধ্য ছিল। এসব কারণে 'ভারী কালাম' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়াকে কঠিন মনে করবেন না। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোপর্দ করব। আপনাকে সাধনায় অভ্যস্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কালাম আপনার প্রতি নাযিল করব, তার জন্য শক্তিশালী যোগ্যতা দরকার। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে] নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তিদলনে খুব সহায়ক এবং (দোয়া হোক কিংবা কিরাআত) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর মুহূর্তে হওয়ার কারণে দোয়া ও কিরা-আতের ভাষা ধীর ও শান্তভাবে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিত্ততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রাত্রির বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে---) নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে (সাংসারিক---যেমন গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ। তাই রাত্রিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাত্রি ছাড়া অন্যান্য সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন অর্থাৎ স্মরণ ও মগ্নতা সার্বক্ষণিক ফরয। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আল্লাহ্র সম্পর্ক সবকিছুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর তওহীদসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধা-য়করূপে গ্রহণ করুন। কাফিররা যা বলে, তজ্জন্যে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। [অর্থাৎ তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। 'সুন্দরভাবে' এই যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিন্তা করবেন না। অতঃপর তাদের আযাবের সংবাদ দিয়ে রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে] বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যা-রোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবর করুন। সত্বরই তাদের শাস্তি হবে। কেন না) আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নি, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। (সুতরাং তাদেরকে এসব বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বালুকা-স্তূপ হয়ে যাবে (এবং উড়তে থাকবে। অতঃপর মিথ্যারোপকারীদেরকে সরাসরি সম্বো-ধন করা হয়েছে এবং রিসালত ও শাস্তি সপ্রমাণও করা হয়েছে) নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি (কিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছ), যেমন ফিরাউনের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা যদি (রসূল প্রেরণের পর নাফরমানী ও) কুফরী